গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা | ১ - ৭ জুলাই ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

পলিটবুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ২৮ জুন বেলা দেড়টায় ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের সকল দলীয় কার্যালয়ে তিন দিনের জন্য রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সকল পার্টি কমরেড কালো ব্যাজ পরিধান করেন। ৩০ জুন সকাল ১১টায় তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনা হয়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় জয়নগরে।

ছাত্র জীবনে মহান নেতা ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা শুনেই তিনি দলের বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কমরেড শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী ও ইয়াকুব পৈলানের নেতৃত্বে জয়নগর অঞ্চলে দলের কাজ করতে শুরু করেন। তিনি দীর্ঘদিন মাধ্যমিক শিক্ষক হিসাবে শিক্ষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ছাত্র-অভিভাবক ও জনগণের মনের গভীরে তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সম্পূর্ণভাবে দলীয় কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৭ সালে দল তাঁকে জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী মনোনীত করে এবং ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি টানা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সরকারের সকল জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বিধানসভায় তাঁর তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য সকলকেই আকৃষ্ট করত। তিনি দীর্ঘদিন দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেছেন। অমায়িক, ভদ্রজনোচিত আচরণ দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে তাঁকে শ্রদ্ধাভাজন করেছিল।

জয়নগর কেন্দ্রে বিধায়ক হিসেবে তিনি এলাকার জনগণের কাছেও ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। রাজ্যের প্রতিটি গণআন্দোলনে তিনি সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতাকে, রাজ্যের জনগণ হারাল এক বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় জননেতাকে। ১১ জুলাই জয়নগরে তাঁর স্মরণসভা। বক্তা সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার লাল সেলাম

ওরা ভয় পায় না পুলিশের লাঠি-গুলিকে ভয় করে না শাসকের রক্তচক্ষুকে

পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে পড়ল জনজোয়ারে। এসপ্ল্যানেডের মুখে। ২৯ জুন

২৯ জুন, কলকাতার রাজপথ অবার সাক্ষী হল যৌবনের তাজা লাল রক্ত ঝরার। সরকার ভেবেছিল কিছু লোহার ব্যারিকেড দিয়ে রুখে দেবে প্রতিবাদের জোয়ারকে। ভেবেছিল এ জোয়ারের ঢেউ মাথা নোয়াবে পুলিশের লাঠির আস্ফালনে আর উর্দিধারীদের কিছু হুমকির সামনে। কিন্তু প্রতিবাদীদের স্রোতের সামনে ভেসে গেল পুলিশের ব্যারিকেড, জলকামানের বিশাল কলেবর, আর নির্বিচারে চালানো লাঠির আঘাত।

লাঠির ঘায়ে যখন প্রতিবাদীদের মাথা ফাটছে, হাত-পা ভাঙছে, কেউ কেউ পড়ে গেলে তার উপর চলছে লাঠির বৃষ্টি, পাগলের মতো লাঠি ঘুরিয়ে পুলিশ যখন চাইছে যে কোনও ভাবে হোক প্রতিবাদের মেরুদণ্ড ভাঙবেই— সে উদ্যত লাঠি রুখে দিয়েছেন প্রতিবাদী তরুণী খালি হাতে। আঘাত পেয়েছেন, রক্ত ঝরেছে কিন্তু প্রতিবাদের জায়গা ছাড়েননি তাঁরা। পুরুষ পুলিশকর্মীরা মারার জন্য বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মহিলা বিক্ষোভকারীদের উপর। শতাধিক আহত, গুরুতর

পাঁচের পাতায় দেখুন

১-৭ জুলাই প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক

যতই মারো, টলব না

নিরস্ত্র আইন অমান্যকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ

মাশুল কমানোর দাবি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পুলিশের লাঠিচার্জ

বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় গড়ে প্রতি ইউনিটে ১ টাকা ৩২ পয়সা। সেখানে বন্টন কোম্পানি গড়ে প্রতি ইউনিট ৭ টাকা ১২ পয়সা এবং সিইএসসি ৭ টাকা ৩২ পয়সা আদায় করে গ্রাহকদের কাছ থেকে। এই অন্যায় দাম অর্ধেক করার দাবি বিদ্যুৎ গ্রাহকরা দীর্ঘদিন তুলছেন। কিন্তু সরকার কান দিচ্ছে না।

বিদ্যুতের মতো অতিপ্রয়োজনীয় একটি পরিষেবার চড়া মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো সহ ছ'দফা দাবিতে অ্যাবেকার আহ্বানে রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ২৩ জুন কলকাতার ডোরিনা ক্রসিং অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান। সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর লাঠি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের আক্রমণে ১১ জন আহত হন। টেনে-হিঁচড়ে ২৯ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ লালবাজার সেন্ট্রাল লক-আপে নিয়ে যায়। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস সহ একজন প্রতিবাদী মহিলা গ্রাহককেও আটক করা হয়। সুব্রত বিশ্বাস বলেন, এদিন সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক রামলীলা পার্কে সমবেত হয়ে সুসজ্জিত মিছিল করে ধর্মতলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন দাবি সংবলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে। ডোরিনা ক্রসিংয়ে পুলিশ মিছিল আটকায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তৈরি স্মারকলিপি তাদের হাতে দিয়ে দিতে বলে। গ্রাহকরা তা দিতে অস্বীকার করে পুলিশের অগণতান্ত্রিক ভূমিকার প্রতিবাদে ডোরিনা ক্রসিং অবরোধ করলে নেমে আসে নির্মম পুলিশি আক্রমণ।

কেন এই আক্রমণ? এলপিএসসি বাৎসরিক ২৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ব্যাঙ্ক রেটে করা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা রাজ্যের মতো এ রাজ্যের কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া, ক্ষুদ্রশিল্পে ফিক্সড চার্জ নেওয়া বন্ধ করা, গার্হস্থ্যে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১০০ ইউনিট বিনামূল্যে দেওয়ার দাবিতে এর আগে ডব্লুবিএসইডিসিএল, ডব্লুবিইআরসি-র চেয়ারম্যান, সিইএসসি কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আলোচনা হয়েছে। সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাতে বলেছেন।

তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি পৌঁছে দিতে এদিন গ্রাহকদের ছিল স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি। সেই শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের গণতান্ত্রিক রীতি দু-পায়ে মাড়িয়ে গেল রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। একচেটিয়া বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে রাজ্য সরকারের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকাকে ধিক্কার জানিয়ে বিদ্যুৎগ্রাহকরা ২৪ জুন সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। অ্যাবেকার সভাপতি অনুকূল ভদ্র গ্রাহকদের কাছে আন্দোলনকে তীব্র করতে এলাকায় এলাকায় গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

আন্দোলনের চাপে সিলেবাসে ভগৎ সিং-কে ফেরাতে বাধ্য হল কর্ণাটকের বিজেপি সরকার

ইতিহাস বিকৃতির বুলডোজার রুখে দিল কর্ণাটকের ছাত্রসমাজ। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পাঠ্যবই সংশোধনের নামে দলবাজির ঘৃণ্য নজির সৃষ্টি করে গৈরিক আদলে ইতিহাস লেখার যে অপচেষ্টা চালাচ্ছিল— ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক, সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা তার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলে তা রুখে দিয়েছেন। আন্দোলনের চাপে মুখ্যমন্ত্রী লিখিত বিবৃতি দিয়ে পাঠ্যবই সংশোধন কমিটি ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছেন। গণআন্দোলনের এ এক ঐতিহাসিক জয়।

দশম শ্রেণির বইয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার শহিদ ভগৎ সিং সম্পর্কিত অধ্যায়টি বাদ দিয়ে তার জায়গায় দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী আরএসএস তাত্ত্বিক হেডগেওয়ারের বক্তব্য। ওরা স্বামী বিবেকানন্দের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতিভেদ প্রথা নিয়ে তাঁর বক্তব্যকে পাল্টে অন্যভাবে লিখেছে। পি লঙ্কেশ, সারা আবুবকর, এএন মূর্তিরাও, নারায়ণগুরু সহ অন্যান্য প্রগতিবাদী লেখকদের সামাজিক ন্যায় এবং লিঙ্গসমতা সংক্রান্ত মূল্যবান লেখা বাতিল করে দিয়েছে। তথ্যের বিকৃতিও ঘটানো হয়েছে। সপ্তম শ্রেণির সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যসূচি থেকে সাবিত্রীবাই ফুলে, কানাকাদাসারু, পুরানদারাদাসারুকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নবম শ্রেণির বইয়ে বাসবান্নার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং আম্বেদকরের সংবিধান-শিল্পীর পরিচয় বাদ দেওয়া হয়েছে। সপ্তম শ্রেণির বই থেকে আম্বেদকরের 'মহদ সত্যাগ্রহ' এবং নাসিক কলারাম মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলন বাদ দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সহ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও এর বিরুদ্ধে প্রথম রাস্তায় নামে। একে একে বহু বুদ্ধিজীবী প্রতিবাদে সামিল হন। প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা পাঠ্যবইয়ে তাঁদের লেখা ছাপার অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন। তাঁরা স্পষ্টই জানিয়ে দেন প্রগতিশীল লেখকদের লেখা যখন বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিক্রিয়াশীল নানা বিষয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তখন তাঁরা নিজেদের লেখা পাঠ্যবইয়ে দেখতে চান না। তাঁদের এই বলিষ্ঠ অবস্থান শিক্ষার গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। সরকার ভগৎ সিং অধ্যায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারক বাসবান্না সংক্রান্ত তথ্যবিকৃতি সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা দেখাল, আন্দোলন যুক্তি ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেও বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব।

আসামে বন্যাদুর্গতের পাশে এস ইউ সি আই (সি)

আসামে এবারের বন্যার তাণ্ডব অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। গুয়াহাটি সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যার তাণ্ডব ভয়াবহ আকার নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনকি শিশুরাও খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। যাতায়ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ৯ হাজারের বেশি গ্রাম ও শহরের সাড়ে ৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ইতিমধ্যেই বন্যায় ১৩১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। প্রত্যন্ত এলাকায় আরও কী ভয়ঙ্কর খবর অপেক্ষা করছে কেউ জানে না।

বরাক উপত্যকার প্রধান শহর শিলচরের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বন্যার জল ছাদ ছুঁয়েছে। সমগ্র রাজ্যে বন্যার প্রকোপ এবং নদী ভাঙনের ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলিতে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছানো দূরের কথা, সামান্য পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছে। সরকার হেলিকপ্টার থেকে জলের বোতল ফেললেও তার বড় অংশই নষ্ট হচ্ছে। রাজধানী গুয়াহাটির অবস্থা বড়ই করুণ। বর্তমান বিজেপি সরকার এবং অতীতের কংগ্রেসী সরকার এই অঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এই নিয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ কিন্তু তাঁরা অসহায়। উত্তর-পূর্ব ভারতে অতিবৃষ্টি খুব অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। অথচ প্রতি বছর বৃষ্টিতে, ভূমি ধসে বহু বাড়ি ধ্বংস হয়, প্রাণহানী ঘটে। সরকার মানুষের জীবনের এতটুকু মূল্য দিলে আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে তা ব্যবহার করে এই বিপর্যয়ের ধাক্কা কমাতে পারত। কিন্তু তারা কিছুই করবে না।

দুর্গত মানুষের পাশে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসকরা

এই বন্যার তাণ্ডবে মিজোরাম এবং ত্রিপুরা এই দুটি রাজ্য দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। খাদ্য এবং অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আকালের সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বন্যার সরকারি সাহায্য না পাওয়ার ফলে ৫ লিটার জলের বোতল ৫০০ টাকা বিক্রি হলেও সরকার যেন দর্শক।

কেন্দ্র এবং সরকার ভাব দেখাচ্ছে যেন তাদের কিছুই করণীয় নেই। কার্যত আসামে প্রধানমন্ত্রী কথিত 'ডবল ইঞ্জিন' কেন, কোনও সরকার আছে বলেই বোঝা যাচ্ছে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বন্য ত্রাণে কেন্দ্রীয় সরকারের গুণগানেই ব্যস্ত। যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে এহেন দুর্যোগের মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বরাদ্দ এমনিতেই নামমাত্র। তার উপর সরকারি আমলা এবং শাসকদলের নেতাদের কাছে দুর্যোগের ত্রাণ 'কামধেনু'র মতো, বন্যা ত্রাণের টাকা তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সকে আরও স্ফীত করে।

এরা এতটাই নিষ্ঠুর যে, বন্যার্ত মানুষ যখন হাহাকার করেছেন, তখন মহারাষ্ট্রে অনৈতিকভাবে সরকার ফেলা খেলায় বিধায়ক কেনা বেচার কাজে মত্ত থাকলেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী। মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু বিজেপি বিধায়ককে গুয়াহাটিতে পাঁচতারা হোটেলে রাখা এবং আপ্যায়ণেই তিনি এবং তাঁর আমলারা ও সরকারি দলের বিধায়ক-সাংসদরা এতটাই ব্যস্ত থাকলেন যে বন্যার্তদের দিকে মন দেওয়ার সময়ই তাঁদের হয়নি।

এই বিপর্যয়ের মুখে এস ইউ সি আই (সি) দল সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যেটুকু ত্রাণের ব্যবস্থা করতে পেরেছে তাতে বিপন্ন জনগণ একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। দলের উদ্যোগে বহু পরিবারের চাল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হয়। দলের কর্মীদের পাশাপাশি এ আই ডি এস ও-র ডাকে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকরা তীব্র জলস্রোতের মধ্যেও যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাকে মানুষ সীমাহীন আশীর্বাদ করেছেন।

বরাক উপত্যকায় অনেকেই দলীয় কর্মীদের ফোন করে বলেছেন আপনারা রিলিফের এই কাজ চালিয়ে যান। আমরা টাকা পয়সা সংগ্রহ করে আপনাদের পাঠাবো। অনেকে দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার চেয়ে নিয়ে টাকা পাঠিয়েছেন। এই সাহায্য রিলিফের কাজে আরও পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে কর্মীদের উজ্জীবিত করেছে। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ আসামের বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন এবং দেশজুড়ে ত্রাণ সংগ্রহে নামার জন্য দলের কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

‘অগ্নিবীর’ নাম দিয়ে এঁদের শোষণ-বঞ্চনাকে চাপা দেওয়া যাবে না

অগ্নিপথ প্রকল্পে চার বছরের জন্য সেনা নিয়োগের সরকারি ঘোষণার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে এ ভাবে যুব-বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়বে তা ছিল শাসক বিজেপি নেতাদের ভাবনার অতীত। তাঁরা ভেবে পাননি যুব সমাজের এই ক্ষোভ স্তিমিত করবেন কী ভাবে। অতীতে যা কখনও ঘটেনি তাঁরা শেষ পর্যন্ত সে পথেরও আশ্রয় নিয়েছেন— যে কাজ সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের, অর্থাৎ এই প্রকল্প সরকার কেন গ্রহণ করল তার ব্যাখ্যা শুধু যুবসমাজের কাছেই নয়, সারা দেশের মানুষের কাছেও স্পষ্ট করা, সেই কাজে তাঁরা সেনাবাহিনীর তিন শীর্ষকর্তাকে নামিয়েছেন। যাঁদের পুরোপুরি রাজনীতির বাইরে থাকার কথা, সেই সেনাপ্রধানরা রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারি এই প্রকল্পের পক্ষে সওয়াল করলেন। কিন্তু প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্যটা কী এবং যুব সমাজের ক্ষোভের প্রধান যে কারণ— চার বছরে অবসরের পর তাঁদের পরিণতি কী হবে, সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাঁরাও দিতে পারেননি। তাঁরা একতরফা শুধু ঘোষণা করেছেন, সেনা নিয়োগে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু হবেই। বিক্ষোভকারীদের বিক্ষোভের কারণ খোঁজা, সেগুলিকে বোঝা এবং সেগুলির নিরসনের কোনও চেষ্টা তাঁদের বক্তব্যে ছিল না। উল্টে আন্দোলনকারী যুবকদের উদ্দেশ্যে তাঁরা হুমকি দিয়েছেন, এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে যাঁরা বাহিনীতে যোগ দেবেন তাঁদের মুচলেকা দিতে হবে যে, তাঁরা বিক্ষোভে অংশ নেননি। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেনাকর্তারা কি তা হলে সরকার-ঊর্ধ্ব ভূমিকা পালন করলেন? কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এভাবে হুমকি তাঁরা দিতে পারেন কি? কে দিল তাঁদের এই অধিকার?

সেনা প্রধানদের নামিয়েও সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। নামাতে হয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে। বাবু যত না বলেন, চিরকালই পারিষদরা বলেন শতগুণ। তিনি আসরে নেমেই ঘোষণা করেছেন, কোনও ভাবেই এই প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে না। যেন প্রত্যাহার করা না করাটা সরকারের নয়, তাঁরই দায়িত্ব! বিজেপি শাসনে সরকারের নীতি নির্ধারণটাও কি তবে এখন নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে নাকি? নাকি বিজেপি নেতারা সংসদ কিংবা মন্ত্রিসভারও উপরে এঁদের জায়গা করে দিয়েছেন? উত্তরটা দেশের মানুষের জানা খুবই জরুরি। দোভাল বলেছেন, অগ্নিপথ কোনও হঠাৎ করে নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই ‘ভেবেচিন্তে’ সিদ্ধান্তটি কোথায় হল, কারা নিলেন? সংসদ জানল না, অভিজ্ঞ সেনাবিশেষজ্ঞরা জানলেন না, দেশের মানুষ জানল না, তা হলে কারা ভেবেচিন্তে এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন?

উত্তরটা বেরিয়ে এসেছে মহিন্দ্রা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান শিল্পপতি আনন্দ মহিন্দ্রার বক্তব্যে। দেশজোড়া যুব-বিক্ষোভ চলার সময়েই তিনি টুইট করে জানিয়েছেন, এক বছর আগেই এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য তাঁদের টেবিলে ফেলা হয়েছিল এবং তাঁরা এই প্রকল্পকে দু-হাত তুলে সমর্থন করেছেন। কিন্তু সেনাবাহিনীতে নিয়োগ কী ভাবে হবে সেই পদ্ধতিগত প্রস্তাব শিল্পপতির টেবিলে কেন? তিনি কি সেনাবাহিনীর উপদেষ্টা বা সরকারের কোনও মন্ত্রী? তেমন কোনও কিছুই তো তিনি নন। তা হলে? অবশ্য আলোচনার জন্য প্রস্তাবটি যে শুধু তাঁর টেবিলেই ফেলা হয়েছিল এমনটা নয়। প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায়, তাঁর মতো সমস্ত বড় বড় শিল্পপতির টেবিলেই প্রস্তাব ফেলা হয়েছিল এবং তাঁদের সবুজ সংকেত পেয়েই সরকার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। আরপিজি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কা, বায়োকন-এর চেয়ারম্যান কিরণ মজুমদার শ’, অ্যাপেলো হসপিটাল গোষ্ঠীর সঙ্গীতা রেড্ডি, টাটা সন্স-এর এন চন্দ্রশেখরন সহ একচেটিয়া শিল্পপতিদের প্রায় সব গোষ্ঠীর সোৎসাহ সমর্থন এটাই প্রমাণ করছে।

সেনাবাহিনীর পুরো গঠন ও নিয়োগব্যবস্থায় এত বড় একটি পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলা হল অথচ তা নিয়ে সংসদে কিছুমাত্র বিতর্ক হল না, বিরোধীরা কিছু জানতে পারল না, দেশের মানুষ জানতে পারল না, জানল শুধু শিল্পপতিরা? তা হলে এর মধ্যে কোথায় গণতন্ত্র? বাস্তবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ছিটেফোঁটাও বিজেপি নেতাদের এই কার্যকলাপের মধ্যে নেই। তা হলে আমরা মার্ক্সবাদীরা যে বলি, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের আড়ালে থেকে সরকারটা তথা দেশটা আসলে চালায় রাজনীতিক-শিল্পপতি-সেনানায়কদের এক শক্তিশালী দুষ্ট-চক্র, সেটাই তো অগ্নিপথ প্রকল্পের ঘটনায় আবারও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল!

টাটা গোষ্ঠীর চন্দ্রশেখরন বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, অগ্নিপথ ভারতীয় তরুণদের জাতীয় সেনাবাহিনীতে কাজের সুযোগ করে দেওয়া ছাড়াও দেশে দক্ষ ও কুশলী একটি কর্মীবাহিনী তৈরি করবে, টাটা গোষ্ঠী-সহ কর্পোরেট সংস্থাগুলি যার সুবিধা পাবে। এই সব শিল্পগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি জানানো হয়েছে, অবসরের পর অগ্নিবীরদের নিয়োগে তাঁদের সংস্থা অগ্রাধিকার দেবে। এই প্রতিশ্রুতির কী মূল্য আছে? এখন যে সেনারা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নিয়ে ৪০ বছর বয়সে অবসর নেন, এই সব শিল্পগোষ্ঠীগুলি তবে নিজ নিজ সংস্থায় তাঁদের নিয়োগ করেন না কেন? তথ্য বলছে, প্রতি বছর প্রায় ৫৫ হাজার সেনা অবসর নেন। তার মাত্র ২ থেকে ৩ শতাংশ নানা সংস্থায় পুনর্নিয়োগের সুযোগ পান, তা-ও বেশিরভাগই নিরাপত্তারক্ষীর মতো অল্প বেতনের কোনও কাজেই। তা হলে মাত্র ৪ বছরের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্তদের কর্পোরেট সংস্থাগুলি কাজে নিয়ে নেবে এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, অগ্নিবীর সেনাদের অবসর পরবর্তী চাকরির বন্দোবস্ত করার বিষয়টি নিয়ে তারা সরকারের সহযোগী হতে আগ্রহী। তাদের প্রস্তাব, কর্পোরেট নিরাপত্তার একটি ছোট কোর্সের কথা ভাবা যেতে পারে, যার মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে অগ্নিবীরদের উপযুক্ত চাকরি দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ কর্পোরেট নিরাপত্তার কথা আসছে কেন? তবে কি এখন সেনাবাহিনীকে লুঠেরা কর্পোরেটদের নিরাপত্তা-কর্মী সরবরাহের কেন্দ্র করে তুলতে চাইছে মোদি সরকার? এই একই কথাই বেরিয়ে এসেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কথায়। বলেছেন, বিজেপি দফতরে নিরাপত্তারক্ষী রাখতে তাঁরা অগ্নিবীরদের অগ্রাধিকার দেবেন। বিজেপি নেতারা সৈনিকদের আসলে কোন চোখে দেখে তা দলের এই শীর্ষ নেতার কথাতেই স্পষ্ট নয় কি!

এ বার দেখা যাক অগ্নিপথ সেনাদের ভবিষ্যতের বিষয়টি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী থেকে সেনাপ্রধান সকলেই বলছেন, সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রয়োজনে সেনাদের গড় বয়স কমাতেই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এটিকে দেশের স্বার্থে সংস্কারমুখী জরুরি পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন। তা হলে এর মধ্যে কোনটি সত্য? সেনাদের গড় বয়স কমিয়ে দক্ষতা ক্ষিপ্রতা বাড়ানোই যদি সত্যি এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যদি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ করে তোলাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তবে তা কি মাত্র চার বছরে সম্ভব? আর যদি তা সম্ভবও হয়, তবে দক্ষ হয়ে ওঠা সেই কর্মীদের চার বছর বাদেই ছুঁড়ে ফেলা কেন? বাহিনীর আধুনিকীকরণই যদি এই প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে তার সাথে চুক্তির ভিত্তিতে ঠিকায় নিয়োগের সম্পর্ক কী এবং তাদের স্থায়ী সৈন্যের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত করার কারণই বা কী? সরকার তথা সেনাবাহিনী যদি যুবকদের যৌবনের তেজকে, তাদের ক্ষিপ্রতা, কুশলতাকে ‘দেশরক্ষার’ কাজে ব্যবহার করে, তবে তারপর তাদের এ ভাবে অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতে ছুঁড়ে ফেলাটা কি তাঁদের সাথে প্রতারণা নয়? কেন তাদের বেতন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর থেকেও কম? এককালীন যে ১১ লক্ষ টাকা তাদের চাকরি শেষে দেওয়ার কথা, কেন তা সরকারি তহবিল থেকে দেওয়া হবে না? কেন তাদের বেতন থেকেই কেটে নেওয়া টাকাই তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে? কেন সরকারের পক্ষ থেকে তাদের মর্যাদাময় নিয়োগের গ্যারান্টি দেওয়া হবে না? প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের কোনও নেতা-মন্ত্রীই এ সব প্রশ্নের সদুত্তর দেননি।

তা হলে তো এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বায়ন উদারিকরণের অন্যতম শর্ত আর্থিক সংস্কারের নামে একের পর এক পুঁজিবাদী সরকারগুলি শ্রমিক-কর্মচারীদের থেকে যে-ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ছেঁটে ফেলেছে, সেই এক কায়দাতেই বিজেপি সরকার সেনাদেরও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ছেঁটে ফেলল। তা হলে কথায় কথায় বুর্জোয়া রাষ্ট্রনায়করা যে জনগণের সামনে সৈনিকদের ‘দেশরক্ষক’, ‘দেশপ্রেমিক’ হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের শৌর্যের বীর্যের যশগাথা গেয়ে বেড়ান, তাদের আত্মত্যাগের মহিমা কীর্তন করেন, দুটি দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ব্যবসায়িক মুনাফার দরকষাকষির দ্বন্দ্বের পরিণতিতে যে যুদ্ধ বাধে, যা আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার বাজার দখলের লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়, তাতে মৃত্যু হলে সেই সৈনিকদের দেশের জন্য ‘মহান আত্মত্যাগী’ হিসাবে প্রচার করেন, কখনও টিভি ক্যামেরার সামনে হয়ত কয়েক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেন, সেই সৈনিকদের তা হলে পরিণতি এই? পুলওয়ামা, উরি অথবা বালাকোটে যে সৈন্যদের মৃত্যু এবং সাহসিকতাকে বিজেপি নেতারা ভোটে তাদের সুবিধার জন্য মানুষের মধ্যে আবেগ তৈরির কাজে লাগালেন, কই সেই ‘মহান সৈনিকদের’ ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলতে এখন তো সেই বিজেপি নেতাদের বিবেকে বাধছে না!

বাস্তবে অগ্নিপথ প্রকল্পের দ্বারা বিজেপি নেতারা সেনাকর্মীদের মজুরি-শ্রমিকের চরিত্রটিকে স্পষ্ট করে দিলেন, প্রমাণ করে দিলেন সেনাকর্মীরাও শোষিত শ্রমিক শ্রেণিরই অংশ। যতই বিজেপি নেতারা এই প্রকল্পে নিযুক্ত সেনাদের ‘অগ্নিবীর’ তকমা দিন, তার দ্বারা তাদের প্রতি সমাজের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষের মতোই চলতে থাকা শোষণ-বঞ্চনাকে ঢাকা যাবে না। এতদিন যে মহিমার চাদরে এই শোষণের চরিত্রটা ঢাকা ছিল, অগ্নিপথের মধ্যে দিয়ে শাসক বিজেপি নেতারা আজ সেই চাদরটাকেই এক টানে খুলে দিয়েছেন। বেরিয়ে পড়েছে তার নগ্ন চেহারাটা।

বিজেপি নেতার মন্তব্যের নিন্দা ডিওয়াইও-র

ঠিকা-সেনা নিয়োগ প্রকল্প ‘অগ্নিপথ’-এর অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের চার বছর বাদে বিজেপি অফিসের নিরাপত্তারক্ষীর কাজ দেওয়া হবে বলে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় যে মন্তব্য করেছেন তার তীব্র নিন্দা করে যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য কমিটির সম্পাদক মলয় পাল ২১ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, এই মন্তব্য চূড়ান্ত অবমাননাকর এবং যুবস্বার্থবিরোধী।

তিনি বলেন, ঠিকা-সেনা নিয়োগের প্রতারণার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে বিক্ষোভে বেসামাল বিজেপি নেতৃত্ব দিশেহারা হয়ে যা খুশি তাই মন্তব্য করছেন। ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পড়ে আজ কোনও নেতা বলছেন অবসরপ্রাপ্ত ‘অগ্নিবীর’দের পুলিশে, অসম রাইফেলসে কাজ দেবেন, আবার কেউ বলছেন তাঁদের বিজেপি অফিসে দারোয়ানের কাজ দেওয়া হবে। এই ধৃষ্টতার জবাবে যুব-আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আমরাও চাইছিলাম আপনারা এমন একটা বড় আন্দোলনে নামুন

২৯ জুন আইন অমান্যের সমর্থনে রাজ্য জুড়ে গত এক মাস ধরে দলের কর্মীরা মানুষের মধ্যে প্রচার করেছেন, তাঁদের সমর্থন চেয়েছেন, অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। পাহাড় থেকে সমুদ্র সর্বত্রই মানুষ দু-হাত তুলে এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। বলেছেন, আর তো কেউ কিছু করছে না, করবেও না। একমাত্র আপনারাই কিছু করছেন। মানুষ আইন অমান্যের কথা জেনে বলেছেন, আর তো পারছি না। এই রমক পরিস্থিতি আমরাও চাইছিলাম আপনারা এমনই একটা বড় আন্দোলনে নামুন। আমরা খুব খুশি হয়েছি আন্দোলনের কর্মসূচিতে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি এলাকায় প্রচার চলছিল। হঠাৎ একদল যুবক এসে বলল, আপনারা আমাদের সাথে আসুন। দেখা গেল, তাঁরা কর্মীদের নিয়ে শাসক দলের স্থানীয় অফিসে ঢোকাল। কর্মীদের ভাবনা, প্রচারে বাধা দিতেই কি এ ভাবে অফিসে ঢোকনো হল! যুবকদের একজন আর একজনকে চা বিস্কুট আনতে বলে কর্মীদের বলল, বলুন কী নিয়ে আপনারা প্রচার করছেন। কর্মীরা বলার পরেই তাঁদের প্রত্যেকের পকেটে যা ছিল সব নিয়ে কর্মীদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এর বেশি আর্থিক সাহায্য আপনাদের এখনই করতে পারছি না। আপনারা এই এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করুন। কেউ বাধা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফোন করবেন। আপনারা নিশ্চিন্তে কাজ করুন। আমরা আপনাদের সাথে আছি।

একটি বাজারে প্রচার চলছিল। একজন কর্মী মাইকে বলছিলেন, অতীতে আপনারা যে ভাবে আমাদের দলের আন্দোলনে পরামর্শ দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, আমাদের আশা এবারও তেমন ভাবেই আমাদের সাহায্য করবেন। কর্মীরা সাহায্য সংগ্রহ করছিলেন। এক দোকানদার এসে কর্মীদের ডেকে নিয়ে গেলেন। দোকানে বসিয়ে চা খাওয়ালেন। তারপর নিজে একশো টাকা দিয়ে পাশের দোকানদারকেও একশো টাকা দিতে বললেন। বললেন, আপনারা এলাকায় ভাল করে কাজ করুন। সব রকমের সাহায্য আমরা করব।

লাঠিপেটা নিরস্ত্র আন্দোলনকারীকে

একটি এলাকায় প্রচার চলার সময়ে একজন এগিয়ে এসে বললেন, আমি বামপন্থী। কিন্তু আমার দল তো আন্দোলন করবে না। আপনারাই আন্দোলন করছেন। আমি আপনাদেরই চাঁদা দেব। আপনাদের পত্রিকাটা আমাকে দেবেন।

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে আইন অমান্যের প্রচার চলছিল। প্রচারের সাথে আর্থিক সাহায্যও চাইছিলেন কর্মীরা। এক ভিখারিনী এগিয়ে তাঁর ঝুলিতে সারা দিনের যা সংগ্রহ ছিল সবটাই ঢেলে দিলেন। বললেন, আমাকে কিছু হ্যান্ডবিল দিন, আমি বিলি করে দেব।

ধিক্কার এই বর্বরতাকে

বহরমপুরের শহরতলির একটি বাজারে দলের প্রচার এর আগে কখনও হয়নি। কর্মীরা এবার প্রচার করতে গিয়ে দেখলেন, সবাই যেন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সকলে আন্দোলনে তহবিলে সাহায্য করলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অনুরোধ করলেন।

কলকাতার সখের বাজারে প্রচার চলার সময়ে এক মহিলা তাঁর মেয়েকে সাথে নিয়ে এসে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তবে আমি একশো টাকা আন্দোলন তহবিলে সাহায্য করতে চাই। বললেন, আমি টাকাটা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই দিলাম। আমার স্বামী এক সময় সিপিএম করতেন। এখন আর করেন না। আজ আপনারা যা করছেন, একদিন আমার মেয়েকেও তাই করতে হবে। ফলে যদি কোনও দিন কিছু দরকার মনে করেন, অবশ্যই বলবেন।

বহু জায়গায় মানুষ বলেছেন, আপনারা নিয়মিত আসুন, সভা করুন, মানুষকে সংগঠিত করুন। আমরা সব রকম সাহায্য করব।

রুখে দাঁড়ালেন ছাত্রীরা

এদের আটকানো অসম্ভব

এত বড় জমায়েত আটকাতে পারে না কি পুলিশ? ২৯ জুন রামলীলা পার্ক থেকে মিছিল বেরোতেই স্থানীয় মানুষ বলাবলি করছিলেন। স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল মিছিলের গর্জন যেন ঢেউ তুলে চলেছে। মিছিল এগোতেই প্রথমে মৌলালির মোড়, তারপর এস এন ব্যানার্জীতে আটকাতে চায় পুলিশ। রাস্তার দু'পাশে সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মিছিল যত এগিয়েছে সংখ্যা তত বেড়েছে। কেউ রাস্তার রেলিং-এ উঠে ফটো তুলছেন। তালতলা মোড়ে একজন বললেন, এসইউসিআই তো, কেউ আটকাতে পারবে না। পুলিশের ক্ষমতা নেই এদের আটকানোর। লাঠি খাবে, তবু ওরা পিছু হটবে না। সাংবাদিকরা একে অপরকে বলছেন, দেখছিস না, কত বড় জমায়েত। রামলীলা পার্ক ছাড়িয়ে মৌলালি পর্যন্ত বিশাল জমায়েত। এদেরকে আটকানো অসম্ভব।

আইন অমান্যে যোগ দিতে নদীপথে যাত্রা সুদূর গোসাবা থেকে

ওরা ভয় পায় না পুলিশের লাঠি-গুলিকে

একের পাতার পর

২০। তাঁদের অনেকের শরীরে একাধিক ক্ষতে চিকিৎসকদের সেলাই করতে হয়। ১০ জনকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। অনেকের মাথা, বুক, হাত ও পায়ের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। একজনের মেরুদণ্ডের আঘাত খুবই গুরুতর হওয়ায় তাকে ভর্তির পরামর্শ দেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

এ দিনের আইন অমান্য ছিল দীর্ঘদিন আগে থেকে ঘোষিত কর্মসূচি। অথচ দেখা গেল ২০ হাজারের বেশি আইন অমান্যকারীকে গ্রেপ্তার করার জন্য কোনও ব্যবস্থাই করেনি পুলিশ। ১৪৪ ধারা ভাঙার পর তাঁদের গ্রেপ্তার করার জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থাই তারা করেনি। বোঝাই যায় আসলে গণতান্ত্রিক পথে আইন অমান্য করতে দেওয়া নয়, বিক্ষোভকারীদের পেটানোটাই ছিল পুলিশের উদ্দেশ্য। তাই ১৪৪ ধারা জারি থাকা এলাকা তো অনেক দূরের কথা, মিছিল এস এন ব্যানার্জী রোড হয়ে কর্পোরেশন বিল্ডিং পার হতেই পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তা আটকায়। নির্ভীক মিছিলকারীরা 'আইন ভাঙো জেলে চলো' স্লোগান দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই শুরু হয় নির্বিচার লাঠিচার্জ।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি প্রতিরোধে এই আইন অমান্যের ডাক রাজ্য জুড়ে আলোড়ন তুলেছে। প্রচারের রেশ যেখানেই পৌঁছেছে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে তাতে সমর্থন জানিয়েছেন। বলেছেন আপনারাই পারবেন এই জোয়ালটা ভাঙতে। ভাঙুন আইন, আমরা পাশে আছি, আর সহ্য হয় না, আমরা আন্দোলন চাই। যতদিন মানুষ পড়ে পড়ে মার খায় আর কপাল চাপড়ায়, সরকার কিছু ডোল অথবা কিছু শ্রী-এর নামে টাকা ছুঁড়ে দিলে পেটে গামছা বেঁধেও তা নিয়ে মুখ বুজে কষ্ট সইতে থাকে মানুষ, সরকার থাকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু আন্দোলনের ডাক, বিশেষত যে ডাক এসেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর মতো জনজীবনের সব সমস্যা নিয়ে গণআন্দোলনের, সমাজ বদলের লড়াইয়ের শক্তির থেকে সে আহ্বান যখন জনমানসে ঢেউ তোলে, মানুষের ঘুমিয়ে থাকা বিবেককে ধাক্কা দেয়— অত্যাচারী শাসক তাকে ভয় না করে পারে না।

মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন রাজ্য নেতৃবৃন্দ

মিছিল শুরুর আগে রামলীলা পার্কের বিক্ষোভ সভায় ছাত্র, যুব, কৃষক, শ্রমিক ফ্রন্টের নেতারা জনজীবনের নানা দাবি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। দলের পলিটবুরো সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, যে আইনের নাগপাশে জনগণকে বেঁধে রেখে যথেচ্ছ দুর্নীতির রাস্তা করে দেয় শাসকরা, সে আইন ভাঙাই যথার্থ মানুষের কাজ। আইন যেখানে অন্যায়, তাকে ভাঙাটাই ন্যায়। তাঁর এই আহ্বান অনুরণিত হয় হাজার হাজার কণ্ঠের শপথ উচ্চারণে। মিছিল শুরু হওয়ার মুখেই পুলিশ তা আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা ভেবেছিল এখানেই দমে যাবে আন্দোলন। কিন্তু তারা সফল হয়নি। প্রতিবাদী অসংখ্য কণ্ঠের স্লোগান যখন একযোগে সুউচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে— যে আইন জীবনের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয়, ভেঙে ফেলবই তাকে। কোনও শাসক নেই যে এই দৃঢ়তাকে ভয় পায় না। এই মিছিলে যুবদের অংশগ্রহণ যেমন চোখে পড়ার মতো ছিল, একই সাথে অসংখ্য মহিলা থেকে শুরু করে বর্ষীয়ান বহু মানুষও যোগ দিয়েছিলেন। শহরের অফিস কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক, গ্রাম্য কৃষক, জবকার্ড হোল্ডার যুবক, আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এমন অসংখ্য পেশা ও সামাজিক স্তরের মানুষ মিশে গিয়েছিলেন প্রতিবাদী জনজোয়ারে।

এই যৌবন জলতরঙ্গ রুখিবে কে?

মিছিল এস এন ব্যানার্জী রোডে ঢুকতেই বারবার তা থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসাররা। কিন্তু সে বাধা কাটিয়ে মিছিল ক্রমাগত এগিয়ে চলতে থাকলে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির সামনে লাঠি চালিয়ে মিছিল থামায় পুলিশ। কমরেড তরুণ মণ্ডল, তরুণ নস্কর সহ কিছুজনকে তারা গ্রেপ্তার করে। সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ব্যাপার হল, মিছিলকারীরা যখন ফিরছেন তখন বারবার পিছন থেকে অতর্কিত অক্রমণ করতে থাকে পুলিশ। তাতেই আহতের সংখ্যা বাড়ে। বিচ্ছিন্নভাবে ফুটপাথ থেকেও নানাজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে থাকে। যাঁরা গ্রেপ্তার হতেই চেয়েছিলেন, তাদের আইন অমান্যের সুযোগ দিয়ে গ্রেপ্তার না করে বারবার পিছনে তাড়া করে বিচ্ছিন্নভাবে ধরা হচ্ছে কেন, এই প্রশ্ন তুলে মহিলা কর্মীরা রুখে দাঁড়ান এলিট সিনেমার সামনে। বহু যুবকও তাতে সামিল হন। এই প্রতিরোধ দেখে পুলিশ পিছু হটতে থাকে, যদিও তার মধ্যেও চেষ্টা করে চলে কিছুজনকে আঘাত করতে। পুলিশের এই জঘন্য আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান স্থানীয় দোকানদার এবং পথচারীরা।

নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করছে বিশাল পুলিশ বাহিনী

টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করছে পুলিশ

লাঠির সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো ভয়হীন এই যৌবন আন্দোলনের যে অধ্যায় সূচনা করল, তা এগিয়ে যাবে বহুদূর।

পাঠকের মতামত

দিকদর্শী কম্পাস

গত ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠা দিবসে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে সুচিন্তিত বক্তব্য সুললিত ভাষায় তুলে ধরেছেন তা আবারও পড়লাম। এ যেন এক দিকদর্শী কম্পাস। সমকালীন ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শোষণবিহীন, শ্রেণিহীন সমাজের জন্য যাঁরা জীবন দান করেছেন, তাঁদের চিন্তার প্রেক্ষিতে কী ভাবে আজও সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সুস্থ মানবসমাজের পরিস্ফূরণের জন্য এক অনন্য চেতাবনি এই বক্তৃতায় পরিস্ফুট।

তাঁর বক্তব্যের ছত্রে ছত্রে মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ১৯৪৯ সালের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, যে কোনও পুঁজিবাদী দেশে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রাণসত্তা হারাবে, বিলুপ্ত হবে—তারই ধারাবাহিক চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত।

এই বক্তব্যে পুরো বক্তব্যটি পরিসংখ্যানগত তথ্যে সমৃদ্ধ। মানবপ্রেমী স্ট্যালিন কী ভাবে পশ্চাদপদ রাশিয়াকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন, শোষণমুক্ত, দাসত্ববিহীন সমাজ সৃষ্টি করেন, আর বর্তমানে পুতিনের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে যুদ্ধ শুরু করা ও ন্যাটোর সামরিক চুক্তির ভয়াবহতা, মন্দাক্রান্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থার যুদ্ধাস্ত্র শিল্পের মাধ্যমে খড়কুটো ধরে অর্থনৈতিক সঙ্কট সামাল দেওয়ার প্রচেষ্টা, ভারত সরকারের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য না রাখার কারণ, সবই প্রাঞ্জল ভাবে তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে।

বৃহৎ পুঁজির ভজনায় লিপ্ত ভারত সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠান বিক্রিতে কেন আগুয়ান, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে কী ভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কালোবাজারির ফাঁস থেকে সমাজকে মুক্ত করা যায়, তা তিনি পরিষ্কার দেখিয়েছেন এই বক্তব্যে।

পুঁজিপতিরা এস ইউ সি আই (সি) পার্টিকে অর্থের বিনিময়ে কিনতে পারেনি, পারা সম্ভবও নয়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, ভোট ও বিপ্লব সমার্থক নয়। বিবেকবোধ সম্পন্ন মানুষ প্রয়াত কমরেড ঘোষের পার্টিকে গোপনে, প্রকাশ্যে সম্মান ও সহায়তা করেন। এই পার্টি আজও ক্ষুদ্র স্বার্থে, প্রচারের স্বার্থে কোথাও অন্যায়ের সাথে কোনও সমঝোতা করে না। ২০১১-তে মন্ত্রীত্বের হাতছানি উপেক্ষা করে আদর্শের ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারে।

কমরেড প্রভাস ঘোষের গোটা বক্তৃতাটাই চুম্বকের মতো টানে। এই আকর্ষণের ভিত্তি নিহিত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার মধ্যে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের উত্তরসূরীরা যেভাবে সমাজ সেবা করে চলেছেন, তা উৎসাহব্যঞ্জক। বিপ্লবের পর বিপ্লবীর নিজের ভিতরের প্রতিবিপ্লবীকে অবদমিত করার বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা এক দিগন্তও হতে পারে বলে এই কলমচির অভিমত।

অতনু ভট্টাচার্য
জয়শ্রী, বেহালা, কলকাতা

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয় বরাদ্দের উদ্দেশ্য সত্যিই কি দেশরক্ষা?

বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে খরচে সর্বকালের রেকর্ড গড়ল ভারত। সম্প্রতি স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউশন (এসআইপিআরআই) -এর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ে ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয়। প্রথম স্থানে আমেরিকা ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চিন। ব্যয়ের নিরিখে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ব্রিটেন ও রাশিয়া। বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয়ের ৬২ শতাংশ বহন করছে এই পাঁচটি দেশ।

২০১২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষা গবেষণা ও পরিকাঠামো খাতে আমেরিকার বাজেট বেড়েছে ২৪ শতাংশ। ২০২১ সালে মোট ব্যয় হয়েছে ৮০ হাজার ১০০ কোটি ডলার। চিন ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ৪.৭ শতাংশ খরচ বৃদ্ধি করেছে। ২০২১ সালে চিনের ব্যয় ২৯ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। আবার চতুর্থ স্থানে থাকা ব্রিটেন ২০২১ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করেছে ৬ হাজার ৮৪০ কোটি ডলার যা ২০২০ সালের তুলনায় ৩ শতাংশ বেশি। পঞ্চম স্থানে থাকা রাশিয়া ২০২০ সালের তুলনায় ২.৯ শতাংশ বেশি বরাদ্দ করেছে এবং ২০২১ সালে তাদের খরচ হয়েছে ৬ হাজার ৫৯০ কোটি ডলার। ঠিক এই সময়ে রাশিয়া ইউক্রেন সীমান্তে সেনা সমাবেশ করতে শুরু করেছিল।

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের নিরিখে তৃতীয় স্থানে থাকা ভারতের বরাদ্দ যথার্থই অবাক করার মতো। ২০২১ সালে ভারত ব্যয় করেছে ৭ হাজার ৬০০ কোটি ডলার যা ২০২০ সালের তুলনায় ০.৯ শতাংশ বেশি এবং ২০১২ সালের তুলনায় যা ৩৩ শতাংশ বেশি। প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের ৬৪ শতাংশ বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে অস্ত্র ও উপকরণ কিনতে ব্যয় করেছে ভারত সরকার। এসআইপিআরআই-এর রিপোর্ট দেখিয়েছে, চিন ও পাকিস্তান সীমান্তে মাঝে মাঝে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তাকে ভিত্তি করে ভারত নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক করে তুলতে চেয়েছে এবং অস্ত্র উৎপাদনের ওপর জোর দিয়েছে।

প্রতিটি দেশই কেন প্রতিরক্ষা খাতে এমন করে বরাদ্দ বাড়িয়েই চলেছে? এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তো দেশের বেশির ভাগ জনগণকে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি থেকেও বঞ্চিত করেই উসুল হয়। বিশ্বের ধনীতম দেশ আমেরিকারও বিরাট অংশের মানুষ কী ভাবে সভ্য সমাজের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়ে চলেছে, করোনা অতিমারির আক্রমণ তা বিশ্বের সামনে বেআব্রু করে দেখিয়ে দিয়েছে। ভারতের সাধারণ মানুষের অবস্থাও কারও অজানা নয়। তা হলে কেন এ ভাবে ব্যয় করা হচ্ছে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ? বিশ্বজুড়ে দেশগুলির স্বাধীনতা কি বিপন্ন হয়ে পড়েছে? প্রতিটি দেশই কি অন্য দেশের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করছে? তাই যদি সত্যি হয় তবে এই আশঙ্কার শেষ কোথায়? এক দেশ অস্ত্রসজ্জা বাড়ালে তো সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেশও তা বাড়াবে। তা হলে অস্ত্রসজ্জা বাড়িয়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কী ভাবে কমতে পারে? আর সব দেশই যদি সত্যি সত্যি যুদ্ধের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে তবে তো সবাই মিলে যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্যোগটাই যথার্থ হত। বিশ্বশান্তির যত বেশি গ্যারান্টি তৈরি করা যাবে ততই তো যুদ্ধের আশঙ্কা কমানো যাবে এবং প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর প্রয়োজনটাও আর থাকবে না।

আরও একটি বিষয় ভেবে দেখার মতো। তা হল 'দেশের প্রতিরক্ষা' কথাটির অর্থ কী? দেশ মানে কি দেশের মাটি পাহাড় পর্বত নদী জঙ্গল? দেশের মানুষ নয়? দেশরক্ষা মানে তো সর্বপ্রথম দেশের মানুষকে রক্ষা করা। কিন্তু এই সব দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা কি দেশরক্ষার মানে আদৌ তা মনে করেন? তা যদি করতেন তবে কি করোনা অতিমারিতে দেশের কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়ে যখন বিনা চিকিৎসায় ছটফট করছে, সামান্য অক্সিজেনটুকুর অভাবে হাঁসফাঁস করে মারা যাচ্ছে, ঠিক তখনই তাদের বাঁচানোর জন্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর থেকেও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানোটা তাদের কাছে বেশি জরুরি মনে হত? গত আড়াই বছরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও লক্ষ লক্ষ মানুষ স্থায়ীভাবে কাজ হারিয়েছে। লক্ষ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। বুভুক্ষু, কাজ হারানো অসংখ্য মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ যখন দেশের আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলেছে, যখন বিশ্বের ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১১৬টি দেশের মধ্যে ১০১-এ নেমে গেছে, তখনই বিপন্নতার ধুয়ো তুলে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বাড়াতে মরিয়া কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। মানুষ রক্ষা বাদ দিয়ে দেশরক্ষার কথাটা যথার্থ হতে পারে না।

আমেরিকা, চিন, ভারত, ব্রিটেন বা রাশিয়া প্রতিটিই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ। আজ গোটা বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই অমোঘ সঙ্কটের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই দেশগুলির প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের আসল উদ্দেশ্য। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সামনে আজ মূল সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে চূড়ান্ত বাজার সংকট, যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে মানুষের কেনার ক্ষমতা ক্রমাগত তলানিতে নেমে যাওয়ার কারণে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মালিকরা উৎপাদন করে সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে। এই মুনাফা আসে শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে, অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে শোষণ করে। যত বেশি শোষণ তত বেশি মুনাফা। ফলে অচিরেই মানুষ তার ক্রয়ক্ষমতা হারায়। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হয় না, তা গুদামজাত হয়ে পড়ে। এই ঘটনা আজ বিশ্বের প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই। ফলে সর্বত্রই সংকটের ছায়া। পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ মুনাফার লালসায় সমগ্র বিশ্বের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করতে করতে একেবারে শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। সঞ্চিত পুঁজি উৎপাদনে খরচ হতে না পেরে অলস হয়ে থাকছে। বাজারে মোট টাকার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় টাকার দাম পড়ে যাচ্ছে। আবার একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা জিনিসের দাম বাড়িয়ে তাদের মুনাফা অটুট রাখতে চাইছে। ফলে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। অর্থনীতিতে দেখা দিচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। মুদ্রাস্ফীতি ক্রমাগত বাড়তে থাকায় আর্থিক বৃদ্ধির হার মন্থর—এই মন্তব্য করেছেন এসআইপিআরআই-এর এক গবেষক। আর এই সমস্যা থেকে বেরোনোর জন্যই অর্থনীতির সামরিকীকরণ। কারণ, এ ক্ষেত্রে বাজারের তথা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয় না। সরকার নিজেই বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে অস্ত্র সহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম তৈরির বরাত দেয় এবং সরকার নিজেই তা কিনে নেয়। এর ফলে কৃত্রিম ভাবে হলেও অর্থনীতিতে সাময়িক একটা তেজিভাব আসে।

প্রধানমন্ত্রী শুরু থেকেই প্রতিরক্ষা খাতে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। ২০০টি প্রতিরক্ষা সামগ্রী বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে কেনা যাবে না বলে সরকার ঘোষণা করেছে। দেখা যাচ্ছে বিগত কংগ্রেস সরকারের সময়ে ২০০১-২০১৪ আর্থিক বর্ষে যেখানে ২০০টি বেসরকারি সংস্থাকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উৎপাদনের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল, গত সাত বছরে সেখানে ৩৫০টি সংস্থাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। গত দু বছরে দেশে তৈরি প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনার কাজে ৫৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণার ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল রানা প্রতাপ কলিতা কলকাতায় মার্চেন্ট চেম্বারের এক সভায় প্রতিরক্ষা বিভাগের ১২,৩০০ কোটি টাকার সরঞ্জাম দেশীয় সংস্থাগুলির থেকে কেনার কথা জানিয়েছেন। হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স এর জেনারেল ম্যানেজার এ লাহিড়ি জানিয়েছেন, তাঁরাও ৫০০০ কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম কিনবেন বেসরকারি সংস্থার থেকে।

এই যে দেশের সরকার জনগণের দেওয়া করের টাকা থেকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম তৈরির বরাত দিয়ে চলেছে, এটিই অর্থনীতির সামরিকীকরণ। এর জন্যই প্রতি বছর বাড়ানো হচ্ছে সামরিক খাতে ব্যয়। আর এই ব্যয় বাড়ানোটাকে দেশের মানুষের কাছে যুক্তিসঙ্গত হিসাবে দেখানোর জন্যই থেকে থেকে পাকিস্তান এবং চিন সীমান্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের বাদ্য। এর জন্যই বিশ্বের দেশে দেশে যুদ্ধের হুমকি, যুদ্ধ জোট। এরই জন্য বিশ্বের জনমতকে অগ্রাহ্য করে রাশিয়া ইউক্রেন এর সাথে যুদ্ধ এবং আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটো জোটের অস্ত্র ও অর্থের জোগান দিয়ে সেই যুদ্ধে মদত।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসে কমরেড স্ট্যালিন বলেছিলেন, বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই অর্থনীতির সামরিকীকরণ ঘটাচ্ছে এবং এই পথে সে সঙ্কট এড়ানোর চেষ্টা করছে। এ দেশের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, পুঁজিবাদের এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং ক্ষয়িষ্ণু যুগে শুধু উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিই নয়, তুলনামূলক অনগ্রসর দেশগুলির অর্থনীতিতেও সামরিকীকরণের ঝোঁক দেখা দিতে বাধ্য। পুঁজিবাদ যত দিন থাকবে, পুঁজির বিপদ, পর রাজ্য আগ্রাসনের বিপদ থাকবে। বাস্তবে শান্তি আন্দোলন অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

জবকার্ড হোল্ডাররা কেমন আছেন প্রধানমন্ত্রী জানতে চেয়েছেন কি

হিমাচল প্রদেশের সিমলায় এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ফাইল সই করার সময়টুকু বাদ দিলে তাঁর নাকি মনেই থাকে না তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি তখন শুধুই দেশের সেবক, ১৩০ কোটি মানুষের নিরলস সেবক মাত্র।

কী ভাবে তিনি সেবা করেন? তিনি ভিডিও-র মাধ্যমে দেশের নানা প্রান্তে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে জানতে চান ওই প্রকল্পগুলির সুফল পেয়ে তাদের জীবন কী ভাবে বদলেছে? এর মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা, জনধন, আয়ুষ্মান ভারত, স্বচ্ছ ভারত, প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মাননিধির মতো নানা প্রকল্প। এর মধ্যে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের কথা উল্লেখ নেই কেন? তা বেমালুম ভুলে গেলেন, না কি ভুলে থাকার চেষ্টা করলেন? অন্যান্য যে সব প্রকল্পের সুবিধার কথা প্রধানমন্ত্রী নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে গেলেন, সেগুলির সুবিধা প্রাপকরা কতটা পাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী কাদের প্রশ্ন করবেন এবং তার উত্তরে কী বলতে হবে সে সবই আমলারা ঠিক করে দেন। দেশের প্রান্তে-প্রত্যন্তের কৃষকেরা, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ জানেন— এ সব কথা নেতাদের মন্ত্রীদের, প্রধানমন্ত্রীদের বলতে হয় নির্বাচন এলে। হিমাচল প্রদেশেও ৬ মাসের মধ্যে ভোট, তাই প্রধানমন্ত্রীর এই আত্মপ্রচার!

কিন্তু ১০০ দিনের প্রকল্প নিয়ে তিনি চুপ কেন? কারণ এই প্রকল্প থেকে বিজেপি সরকার হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ৪৫ বছরে সর্বাধিক বেকারির রেকর্ড গড়া বিজেপির ভারতে রোজগারহীন মানুষ, ছাঁটাই শ্রমিক, বন্ধ চা-বাগানের হাড় জিরজিরে শ্রমিক বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে এই ১০০ দিনের কাজের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। হাড়ভাঙা খাটুনির পর দিনশেষে ২৮০ থেকে ২৮৫ টাকা পেত। তাও বন্ধ হওয়ার পথে। এই প্রকল্প ঘিরে বহু চুরি-দুর্নীতি-দলবাজি থাকলেও তা বাদ দিয়ে তাদের হাতে যেটুকু পয়সা আসত, তাতেই ক'দিন পেটে কিছু পড়ত। মোদি সরকারের 'দাক্ষিণ্যে' সেই সুযোগও বন্ধের মুখে।

১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প কী? ২০০৬ সালে এটি চালু হয়েছিল গ্রামীণ মানুষকে সামান্য হলেও কিছু রোজগারের বন্দোবস্ত করে দিতে। এর মাধ্যমে দেশ জোড়া অর্থনৈতিক সংকটের সর্বগ্রাসী হাঁ-কে একটু নিরস্ত করার আশা ছিল সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থে রাজ্যে রাজ্যে গরিব মানুষরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা তৈরি, মাটি কাটা, কুয়ো খোঁড়া, খাল কাটা, সেচের কাজ কিংবা শৌচালয় তৈরি করার কাজ করে থাকেন। বহু অস্বচ্ছতা থাকলেও এই প্রকল্পে কাজ করে বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিন, কোথাও বা ৮০-৯০ দিন কাজ পেয়েও কিছু মানুষ সামান্য হলেও রোজগার করতেন। এতে কম-বেশি ৫ কোটি পরিবারের এক জন্য সদস্যের কাজ জুটত। শ্রমিকদের মধ্যে যখন দাবি উঠছে এই প্রকল্পে বছরে ২০০ দিন কাজ দিতে হবে তখন মোদি সরকার এই প্রকল্পকে আরও দুর্বল করছে। গত বছরের হিসাব অনুযায়ী ন্যূনতম ৯৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের দরকার ছিল এই প্রকল্পে। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মাত্র ৭৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বিজেপি সরকার।

এই প্রকল্পে শুধুই বরাদ্দ কমাচ্ছে না সরকার, উপরন্তু এই প্রকল্প থেকে দেশের দরিদ্র মানুষকে দূরে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নানা কৌশল নিচ্ছে। এই প্রকল্পে কর্মরতদের বিশেষ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ছবি সহ হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এই নির্দেশিকার ফলে সব কর্মীর অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকা বাধ্যতামূলক, যা বেশিরভাগ গরিব পরিবারের পক্ষে অসম্ভব। এ ছাড়াও স্বল্পশিক্ষিত কর্মীদের পক্ষে ফোনে ইংরেজিতে প্রতিটি ধাপ বুঝে দিনে দু'বার হাজিরা নথিভুক্ত করাও সম্ভব নয়। আর নথিভুক্ত করাতে না পারলে তাদের কাজের সুযোগ বন্ধ, বন্ধ আয়ও।

দীর্ঘদিন থেকেই এই প্রকল্প বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে বিজেপি সরকার। কখনও দুর্নীতি দমনের নামে, কখনও কৃষিপ্রধান এলাকায় কৃষিতে মজুর পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাতে বরাদ্দ বন্ধ করে, মাসের পর মাস টাকা বকেয়া রেখে এই প্রকল্পকে নড়বড়ে করার চেষ্টা করছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গেই খালি সাত হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া। কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ যারা এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন, তারা এক ধাক্কায় পথে বসেছেন। ১০০ দিনের কাজ অনিয়মিত হওয়ায় 'হাত সম্বল করে' জমিতে, নির্মাণক্ষেত্রে, পরিযায়ী শ্রমিক, পরিচারিকা, হকার, রাঁধুনির কাজ, এমনকী সেলাইয়ের মতো টুকিটাকি কাজ করে সংসার চালানোর চেষ্টা করতে হচ্ছে এঁদের।

সরকারের কি টাকার অভাব? তাও নয়। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের ভারত রয়েছে তৃতীয় স্থানে, আমেরিকা ও চীনের পরে। নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের বিলাস-ব্যসনে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়, তবে ১০০ দিনের প্রকল্পেই বা টাকার অভাব হবে কেন?

কয়েক বছর আগে এই প্রকল্প সংকোচনের সর্বনাশা সিদ্ধান্ত সরকার ঘোষণা করার পরপরই তীব্র প্রতিবাদ হয়েছিল। বহু অর্থনীতিবিদ দেশের গরিব মানুষের স্বার্থে তা প্রত্যাহার করার জন্য চিঠি পাঠান স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে। সেই প্রতিবাদ বা দাবির তোয়াক্কা করেনি মোদি সরকার। উল্টে সরকারের এই পদক্ষেপের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নীতিন গডকরি। তিনি বলেছেন, 'পাঞ্জাব, হরিয়ানার মতো কৃষিকেন্দ্রিক রাজ্য চাষের মজুর পাচ্ছে না, ফলে রাজ্যগুলিতে কৃষিকাজ করার জন্য তারা দেশের ২০০টি জেলার মধ্যে ১০০ দিনের প্রকল্প সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন।' এটাই হল আসল কথা, যা গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। বিপুল কৃষি-মজুরদের বেকারত্বের সুযোগে সস্তায় মজুরদের কাজে লাগিয়ে কিছু সংখ্যক ধনী চাষি বা একচেটিয়া কৃষি-কর্পোরেটদের আকাশছোঁয়া মুনাফার সুযোগ করে দিতেই তাদের এই পদক্ষেপ। একটা 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে সরকারের যেটুকুও জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা জনসাধারণকে দেওয়ার কথা, তার থেকেও হাত গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে একটু একটু করে এই প্রকল্পকে নানা অজুহাতে দুর্বল করা হয়েছে। এবারে বাজেটে বরাদ্দ ছাঁটাইয়ে এই প্রকল্প বন্ধের সরকারি অভিসন্ধিই প্রমাণিত হল।

সরকারি অবহেলায় বহু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংকটে

চালের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে ১৯ শতাংশ, ডিমের দাম ১০ শতাংশের বেশি, জ্বালানির দাম ৮ শতাংশ এবং ডাল-আনাজের দাম বৃদ্ধিতে (এনএসও-র রিপোর্ট-গত মার্চের তুলনায় এ বছরের মার্চ মাসে) সাধারণ মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। দু'বছর যাবত করোনা অতিমারি পরিস্থিতি, তার উপর বিপুল মূল্যবৃদ্ধিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি সংকটের মুখে পড়েছে। ডিম, সয়াবিন দূরের কথা, চাল-ডালের খিচুড়িও মিলছে না বহু জায়গায়। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের খাবারের মান নামছে এবং পরিমাণও কমছে।

দক্ষিণে সুন্দরবন থেকে উত্তরে চা-বাগান সর্বত্র অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ধুঁকছে। পানীয় জল, শৌচালয়, রান্নাঘর সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাব সব কেন্দ্রগুলিতেই চোখে পড়ে। কোনও কোনও কেন্দ্রে নীল-সাদা রঙের পোচ পড়লেও ভেতরের মলিন দশা চোখ এড়ায় না। অথচ এই কেন্দ্রগুলির উপর গরিব পরিবারের শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের টিকাকরণ, পুষ্টি, শিশুদের শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

১৯৭৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এই প্রকল্প চলছে। সরকার বদলেছে, নেতা বদলেছে, কিন্তু এই প্রকল্পের সংকট কমেনি, বরং তা আরও বেড়েই চলেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা নামমাত্র বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন বছরের পর বছর। এর উপর 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'— কেন্দ্রগুলির জন্য বরাদ্দ সরকারি সাহায্য এসে পৌঁছয় না মাসের পর মাস। বকেয়া অর্থ না পাওয়ায় নিজেদের পকেট থেকে বাজার খরচ সামলাতে হয় বহু কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। সরকারি সাহায্য না পেয়ে শয়ে শয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পূর্ব বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ সর্বত্রই একই অবস্থা। জেলাগুলির বহু কেন্দ্র বন্ধ, অনেকগুলি অনিয়মিত ভাবে চলছে। ছ' বছরের শিশু থেকে প্রসূতি— কেন্দ্রগুলির সুবিধা-প্রাপকরা পড়েছেন বিপদে। প্রশাসন নিশ্চুপ। কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারের হেলদোল নেই। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বুঝেছেন, আবেদন-নিবেদন নয়, সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, কেন্দ্রগুলির উপযুক্ত পরিকাঠামো সহ নানা দাবি আদায় করতে হবে আন্দোলনের পথেই। তাঁরা সংগঠিত হয়ে শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে গড়ে তুলেছেন আন্দোলন।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ছাড়পত্র পেল

অবশেষে বহু চর্চিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটির ছাড়পত্র পেল। কমিটির এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি এক বিবৃতিতে বলেন, অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে অর্থ মঞ্জুর করে প্রয়োজনীয় টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে কাজ শুরু করতে হবে।

দুই মেদিনীপুর জেলার স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে তৈরি হওয়া 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের টেকনিক্যাল কমিটির ছাড়পত্র পেয়েছিল। কেন্দ্র ও রাজ্যের টানাপোড়েনে প্ল্যানটি দীর্ঘদিন ধামাচাপা থাকার পর ২০২১ সালে বিধ্বংসী বন্যার পর নতুন করে দাবি ওঠে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ফ্ল্যাড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বর্ডার এরিয়া প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয় রাজ্য সরকারকে। ১২৩৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পে কেন্দ্র খরচ করবে ৬০ শতাংশ ও রাজ্য ৪০ শতাংশ। এই প্রকল্প নিয়ে টালবাহানা এখনই শেষ করার দাবি জানিয়েছে কমিটি।

বিজেপি-আরএসএসের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার বিরুদ্ধে কলকাতার রামলীলা পার্ক থেকে মহাজাতি সদন পর্যন্ত বামপন্থী দলগুলির যুক্ত মিছিল। ২১ জুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

আইন অমান্যে ব্যাপক পুলিশি বর্বরতা

১-৭ জুলাই প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের আহ্বান

আবারও রক্তাক্ত হল কলকাতার রাজপথ। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কর্মী এবং প্রতিবাদী জনতার রক্ত ঝরলো তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকারের পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণে। প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ নস্কর সহ ৭৯ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে ২৯ জন মহিলা এবং ২০ জন গুরুতর আহত। পুরুষ পুলিশের তাণ্ডবের শিকার হতে হয়েছে মহিলা আইন অমান্যকারীদেরও। এছাড়াও শতাধিক কর্মী আহত হয়েছেন। মহানগরী সাক্ষী থাকল একদিকে অতীতের সরকারগুলির মতোই বর্তমান সরকারের পুলিশের ঘৃণ্য আক্রমণের, আর অন্যদিকে প্রত্যক্ষ করল প্রতিবাদমুখর ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক-মহিলার লড়াকু মানসিকতার। শোষণ, নিপীড়ন, জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আজ তাই শুধু প্রতিবাদ নয়— গড়ে তুলতে হবে গণ প্রতিরোধ। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই অগণিত মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে

মিছিল থেকে গ্রেফতার করছে পুলিশ

পুলিশি অত্যাচারে আহত হয়েছেন শতাধিক কর্মী

সামিল হয়েছিলেন পূর্ব ঘোষিত আইন অমান্য আন্দোলনে। রামলীলা পার্ক থেকে মিছিল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মিছিলের পথ আটকায়। কিন্তু আন্দোলনকারীদের বলিষ্ঠতায় পুলিশ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তালতলাতে পুলিশ মিছিল আটকাতে চাইলে আবারও ব্যর্থ হয়, পুলিশি বাধা অতিক্রম করে দৃপ্ত মিছিল এগিয়ে চলে। মিলিত কণ্ঠে তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলেছিলেন — এসএসসি, নার্স সহ বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মী নিয়োগে চরম দুর্নীতি ও স্বজন পোষণ এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে। রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে তারা প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন শিক্ষাবিদদের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে বসানো হবে? কেন স্কুল শিক্ষার সর্বনাশ সাধিত হবে? কেন রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে না? আজও খেতমজুরের সারা বছরের কাজ, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির নিষ্পত্তি হল না কেন? কেন মা-বোনেদের সম্ভ্রম ধূলায় লুণ্ঠিত হবে? কেন তাদের অকালে নির্যাতিতা হয়ে খুন হতে হবে? দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিয়ে কেন অভিযুক্ত শাসক দলের নেতা-কর্মীদের আড়াল করা হবে? 'দুয়ারে মদ' প্রকল্প অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে স্লোগানে প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল সেই মিছিল।

সাথে সাথে এই মিছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি তুলেছিল, দেশে যখন চূড়ান্ত বেকার সমস্যা তখন শুধুমাত্র রেলওয়েতে ৮০ হাজার পদ বাতিল করা হয় কোন যুক্তিতে? 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের নামে এমনকি সেনাবাহিনীতেও দেশের যুবকদের স্থায়ী চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কার স্বার্থে? কেন রেল, ব্যাঙ্ক-বিমা-টেলিকমিউনিকেশন সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের নামে পুরো দেশকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের কাছে? কার স্বার্থে কর্মী সংকোচন নীতি? কার স্বার্থে শ্রম কোড এর নামে শ্রমিকদের সমস্ত অধিকার ও মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার আইন? কেন আজও কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত? পেট্রল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস, কেরোসিন সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে মানুষকে লুঠ করা হচ্ছে কেন? কেন জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা? শাসক দল ও সরকার ধর্ম ও জাতপাতের নামে কেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত? মুখে বিরোধিতা করলেও কেন রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতিকে কার্যকর করছে?

আইন অমান্যের দৃপ্ত মিছিল এ সমস্ত জ্বলন্ত প্রশ্নের জবাব চেয়েছিল, প্রতিকার দাবি করেছিল। মিছিলে উত্থাপিত সহজ প্রশ্ন আর যুক্তিসঙ্গত দাবির কোনও উত্তর ছিল না আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে থাকা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী এই শাসকদের কাছে। তাই সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে পদদলিত করে রাজ্য সরকার লাঠি, ঢাল, বর্ম, বন্দুক, কাঁদানে গ্যাস ইত্যাদি নিয়ে কাপুরুষের মতো হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে এনেছে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর। প্রতিবাদী ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষক, মহিলারা কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা ভীরু নন, আক্রমণের মুখে পিছিয়ে যাওয়ার মতো মানুষও নন। তারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ। তারা নিরস্ত্র হয়েও পুলিশের নৃশংস আক্রমণকে মোকাবিলা করেছেন। জনজীবনের জ্বলন্ত দাবিগুলিকে উত্থাপন করেছেন। অগণিত মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাই তারা রক্তস্নাত হয়েছেন, তবু অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে মুখর থেকেছে তাদের কণ্ঠস্বর। তাদের মনে ছিল দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সুদৃঢ় প্রত্যয় এবং মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা— **"... বিপ্লবী আন্দোলন এবং লড়াই যারা গড়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করে, প্রথমে তাদের দিতে হয় বেশি, মরতে হয় বেশি, ত্যাগ করতে হয় বেশি ... তাদের মনোভাব থাকে, তারা মরবে তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, ... তারা লড়াই ছাড়বে না"**। মনে রাখতে হবে, একটা সঠিক আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শাসক শ্রেণির

ভাবিয়াছ কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা!

আক্রমণকে প্রতিহত করা সম্ভব। তাই আজ প্রয়োজন শহরে, গ্রামে, গঞ্জে একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ধর্ম-বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে নিষ্পেষিত জনসাধারণের ব্যাপক ঐক্য। গড়ে তুলতে হবে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিবাদ।

সেই প্রতিবাদকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে শহরে-গঞ্জে গড়ে তুলুন জনসাধারণের সংগ্রামের হাতিয়ার নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। গ্রামীণ ক্ষেত্রে গড়ে তুলুন কৃষকদের সংগ্রামী কমিটি। ছাত্র যুব মহিলারাও গড়ে তুলুন সংগ্রামের হাতিয়ার। এর মধ্য দিয়েই গণআন্দোলনকে ধাপে ধাপে উন্নীত করুন। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এই আহ্বান রেখেছেন।

গুজরাট দাঙ্গা ঃ নরেন্দ্র মোদি ইতিহাসে দায়ী হয়ে থাকবেন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, গুজরাটের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা ও এহসান জাফরি সহ অসংখ্য মানুষের হত্যালীলায় সরাসরি জড়িত থাকার দায় থেকে নরেন্দ্র মোদি সুপ্রিম কোর্টে রেহাই পেতে পারেন, কিন্তু জনগণের বিবেকের আদালতে তিনি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ইতিহাসে অপরাধী হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

বিজেপি পরিচালিত গুজরাট সরকার প্রতিহিংসার বশে যেভাবে মানবাধিকার কর্মী তিস্তা শেতলবাদ সহ অন্যদের গ্রেপ্তার করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। তাঁদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com